মানবপাচার রোধে করণীয়

ড. বদিউল আলম মজুমদার এবং এ কে এম রিয়াজ উদ্দীন (১৬ জুন ২০১৫)

প্রায় আড়াই শ বছর আগে জিন-জিকো রুশো তাঁর *দ্যা নিউ সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট* গ্রন্থে লিখেছিলেন যে, মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করলেও, সব জায়গাই সে শৃঙ্খলিত। আর দাস প্রথা ছিলো মানুষের স্বাধীনতা হরণের একটি জঘন্যতম পন্থা। তাই মানব সভ্যতার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হলো এই দাস প্রথার বিলুপ্তি। মোরিতানিয়া হচ্ছে সর্বশেষ রাষ্ট্র যেখানে আইনগতভাবে ১৯৮১ সালে দাস প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যবশত বিভিন্ন দেশে 'নব্য দাস প্রথা' এখনও বিরাজমান।

'গ্লোবাল ফান্ড টু অ্যান্ড স্লেভারি'র নির্বাহী প্রধান জিন বেডারস্লাইডার-এর মতে, 'আধুনিক দাসপ্রথা হলো একটি ছাতার মত পরিভাষা, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সব ধরনের জবরদস্তিমূলক শ্রম, ঋণ দাসত্ববন্ধন (debt bondage), মানবপাচার, জবরদস্তিমূলক বা কৃতদাসসূলভ বিয়ে অথবা শিশুদের অপব্যবহার। এর মাধ্যমে ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়িক স্বার্থে ধারাবাহিকভাবে ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়া হয়।' যৌন-দাসত্ব ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহারের লক্ষ্যে মানুষের ব্যবহারও নব্য দাসত্বের অন্তর্ভুক্ত।

সাম্প্রতিককালে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশে একটি নগ্ন ধরনের নব্য দাসপ্রথার আবির্ভাব ঘটছে। বাংলাদেশ, মিয়ানমার এবং মালয়েশিয়ার একদল মানুষ এ অপকর্মের সাথে জড়িয়ে পড়েছে। মানবপাচার, জিম্মিকরণ, জবরদস্তিমূলক কারারুদ্ধকরণ, এমনকি হত্যা তাদের অপকর্মের অংশ।

'গ্লোবাল স্লেভারি ইন্ডেক্স' প্রতিবেদন অনুসারে, বাংলাদেশের ছয় লাখ ৮০ হাজার ৯০০ ব্যক্তি আধুনিক দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ, যা দেশের জনসংখ্যার ০.৪৩৫%। এদিক থেকে জনসংখ্যার হিসেবে পৃথিবীতে বাংলাদেশের অবস্থান নবম। আর জনসংখ্যার শতকরা হারের বিচারে বাংলাদেশের অবস্থান ৫৯।

জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর-এর তথ্যমতে, ১৯৯১ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে বহির্বিশ্বে এবং বহির্বিশ্ব থেকে বাংলাদেশে আশ্রয় প্রার্থী (asylum seeker) জনসংখ্যা দুটিই বেশি ছিল। পরবর্তীতে ২০০৯ সাল থেকে বাংলাদেশে আশ্রয় প্রার্থী উদ্বাস্তুর সংখ্যা আবার বৃদ্ধি পায়, যা এখনো অব্যাহত আছে। সম্ভবত মিয়ানমারের রোহিঙ্গা সংকটই সাম্প্রতিক এই উর্ধ্বগতির কারণ।

রেখাচিত্রঃ বাংলাদেশ থেকে ও বাংলাদেশে আশ্রয়প্রার্থী

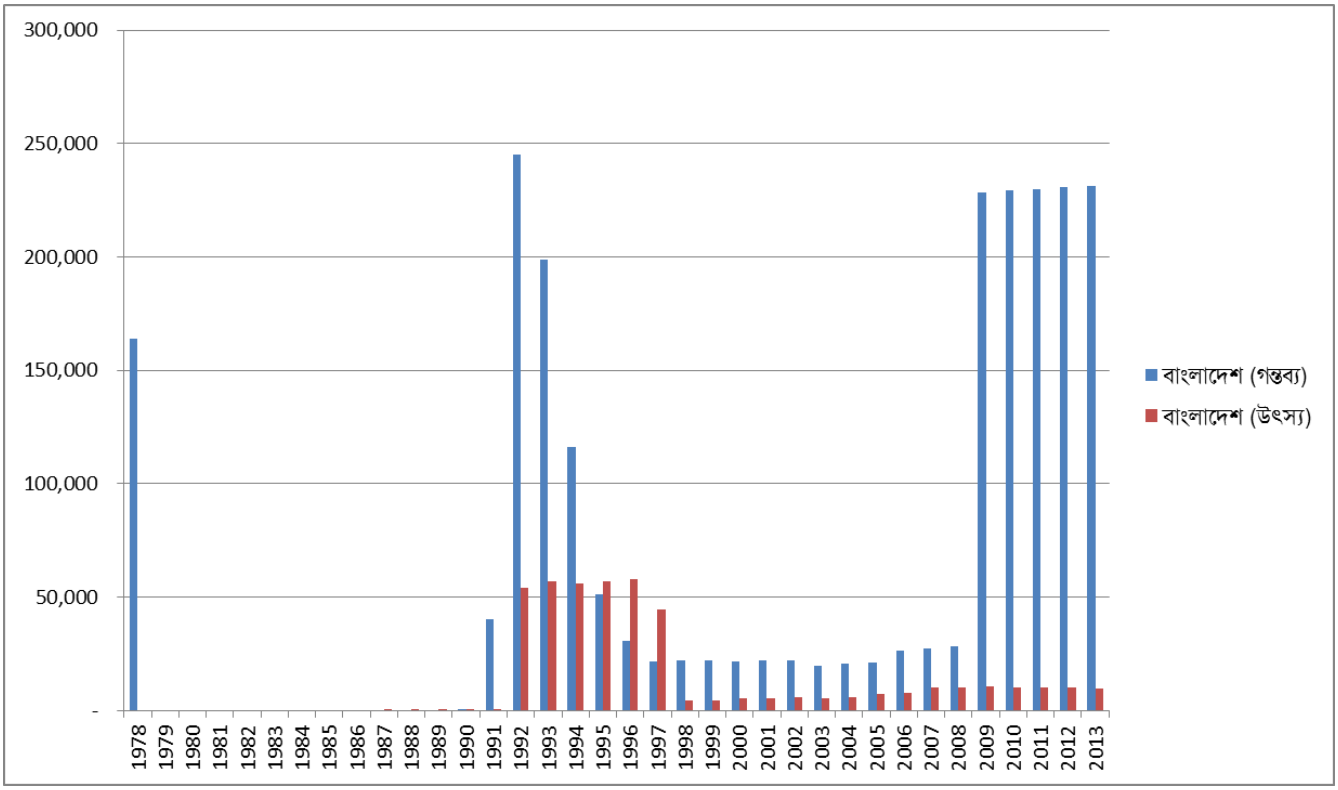

বাংলাদেশ-মিয়ানমার থেকে মানবপাচারের সূচনা

বহু শতাব্দী থেকেই এক দেশের মানুষ অন্য দেশে যাওয়া-আসা করেছে এবং আশ্রয় নিয়েছে। বাংলাদেশ থেকেও অনেক দেশে এবং বালাদেশেও অন্য দেশের মানূষ জীবন ও জীবিকার তাগিদে আশ্রয় খুঁজেছে। ইউএনএইচসিআর-এর তথ্যানুযায়ী:

- ১৯৯১-৯৭ সালে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ বৈধভাবে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে এবং বাংলাদেশ থেকেও অন্যদেশে পাড়ি জমিয়েছে। উভয়ে ক্ষেত্রেই এরপর ভাটা পড়ে।
- ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ থেকে সর্বনিম্ন সংখ্যক বৈধ অভিবাসী বিদেশে যায়। এরপর থেকে আবার বাংলাদেশ থেকে ক্রমাগতভাবে, যদিও নিম্নহারে, বৈধ অভিবাসীর সংখ্যা বাড়তে থাকে।
- ২০০৯ সাল থেকে আবার বাংলাদেশে বৈধ অভিবাসীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। এটা প্রায় নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, মিয়ানমার থেকে ক্রমবর্ধমানহারে রোহিঙ্গা বিতাড়নের কারণেই তা ঘটছে।
- অনেকদিন থেকেই বৈধ অভিবাসনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবৈধ অভিবাসনের পরিমাণও দিন দিন বাড়ছে। অবৈধ অভিবাসনের একটি বড় গন্তব্যস্থল হলো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো, বিশেষত মালয়েশিয়া।
- গণমাধ্যমের তথ্যানুযায়ী, ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ায় মোট সাত লাখ ১১ হাজার ২৩৫ সংখ্যক বৈধ অভিবাসী জীবন-জীবিকার তাগিদে আশ্রয় নেয়।
- ২০০৭ সালে মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক নেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। ২০১২ সালে দু দেশের মধ্যে এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এরপর মালয়েশিয়ায় যাওয়ার জন্য ১৪ লাখ লোক নিবন্ধন করে। কিন্তু মাত্র সাত হাজার বাংলাদেশি মালয়েশিয়ায় যাওয়ার সুযোগ পায়।
- তাই এটি সুস্পষ্ট যে, বৈধভাবে মালয়েশিয়ায় যাওয়ার সুযোগ কমে যাওয়ায় বেড়ে যায় অবৈধ অভিবাসন। বিপুল সংখ্যক অবৈধ অভিবাসী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সমুদ্র পথে থাইল্যান্ড হয়ে মালয়েশিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। গত কয়েক মাসে কয়েকটি ঘটনার কারণে বাংলাদেশ-মিয়ানমার ও মালয়েশিয়ার মধ্যে পাচারের বিষয়টি সারা পৃথিবীর গণমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

নিচের সারণির মাধ্যমে সাম্প্রতিক সময়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত মানবপাচার ও থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়ায় গণকবরের ঘটনাক্রম উল্লেখ করা হলো–

সারণি: ১

তারিখ	ধরন	যাদের দ্বারা উদ্ধার/সন্ধান	অভিবাসীদের নাগরিকত্ব
৫ মে ২০১৫	থাইল্যান্ডের শংখলা প্রদেশে তিনটি ঘাটির খোঁজ, বেঁচে যাওয়াদের ভাষ্যমতে, ৫০০ জনকে হত্যা	থাই পুলিশ	
১০ মে ২০১৫	১২৩ জন অভিবাসীকে থাইল্যান্ডের শংখলা প্রদেশ থেকে উদ্ধার	থাই পুলিশ	৯১ জন বাংলাদেশি, ৩২ জন মিয়ানমারের
	জলযান থেকে ৬০০ অভিবাসী উদ্ধার	ইন্দোনেশিয়ার নৌবাহিনী	বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের
১১ মে ২০১৫	মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার উপকুল থেকে ১৪০০ অভিবাসী উদ্ধার	মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার পুলিশ	বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের
১২ মে ২০১৫	টেকনাফ থেকে ১১৬ জন উদ্ধার		
১৫ মে ২০১৫	ইন্দোনেশিয়ার উপকূল থেকে ৭৪৭ অভিবাসীকে উদ্ধার	ইন্দোনেশিয়ার নৌবাহিনী	বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের
১৮ মে ২০১৫	টেকনাফ থেকে ৬ জন উদ্ধার		
১৮ মে ২০১৫	সেন্টমার্টিন দ্বীপ থেকে ৭ জন উদ্ধার		
১৯ মে ২০১৫	মিয়ানমার সীমান্ত থেকে ৫ জন উদ্ধার		
২০ মে ২০১৫	ইন্দোনেশিয়ার আচেহ প্রদেশের উপকূল থেকে ৫০০ অভিবাসী উদ্ধার		বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের
২৬ মে ২০১৫	মালয়েশিয়ার থাইল্যান্ড সীমান্তবর্তী পাহাড়ি এলাকায় ১৩৯টি গণকবর খোঁড়ার কাজ শুরু	মালয়েশিয়ার পুলিশ	বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের
৮ জুন ২০১৫	২১ মে ২৮৪ জনকে আটকের পর ১৫০ জনকে ফেরত দেওয়া হয়	মিয়ানমারের নৌবাহিনী	বাংলাদেশি

- ইউএনএইচসিআর-এর তথ্যমতে, সার্বিকভাবে ২০১৫ সালের প্রথম তিন মাসে অর্থাৎ জানুয়ারি থেকে মার্চে বঙ্গোপসাগর দিয়ে ২৫,০০০ ব্যক্তি অবৈধভাবে দেশত্যাগ করে। এই সংখ্যা ২০১৩ এবং ২০১৪ এর একই সময়ের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। উপরোক্ত ২৫,০০০ উদ্বাস্তুর প্রায় ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে যাত্রা করেছিলেন। তবে বাকি প্রায় সকল যাত্রীই বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা থেকে গিয়েছিলো।
- ইউএনএইচসিআর-এর এক কর্মকর্তা ই-মেইল মারফত আমাদের জানান, ৯ জুন থেকে ১৫ জুন ২০১৫ পর্যন্ত ভারত মহাসাগর দিয়ে আনুমানিক ৮১৭ বাংলাদেশি এবং ১,০০১ জন রোহিঙ্গা ইন্দোনেশিয়া, সাত শ'র অধিক বাংলাদেশি মালয়েশিয়া এবং ৫২ জন বাংলাদেশি এবং ৫৯ জন রোহিঙ্গা থাইল্যান্ডের সমুদ্র উপকূলে পৌঁছে। এখনও প্রায় দু হাজার মানুষ বিভিন্ন নৌকায় সাগরে ভাসমান রয়েছেন।
- ১৪ জুন ২০১৫ দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে মানব পাচারের শিকার ৫৯৮ জন নিখোঁজ ব্যক্তির একটি তালিকা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে জমা দিয়েছে অভিবাসীদের নিয়ে কাজ করা সংগঠন কারাম এশিয়া বাংলাদেশ। থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়ায় গণকবর আবিষ্কার এবং তার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে নিখোঁজদের বিষয়ে তথ্যের জন্য ১ জুন হটলাইন চালু করে সংস্থাটি। এরপর গত ১৩ জুন পর্যন্ত ৫৯৮ জন সমুদ্রপথে মানব পাচারের শিকার নিখোঁজ ব্যক্তির তথ্য পাওয়া যায় বলে জানায় কারাম এশিয়া বাংলাদেশ (*প্রথম আলো*, ১৫ জুন ২০১৫)।

কেন এই মানবপাচার

বৈধভাবে অভিবাসনের সুযোগ কমে যাওয়া: বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সি (বায়রা) এর তথ্যানুয়ায়ী, বাংলাদেশ থেকে বহির্বিশ্বে অভিবাসন সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কমে গিয়েছে। একই সময় প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণও পূর্বের তুলনায় কমে যায় (নিচের রেখাচিত্র-২ দেখুন)।

রেখাচিত্র (২): বছরভিত্তিক অভিবাসন চিত্র

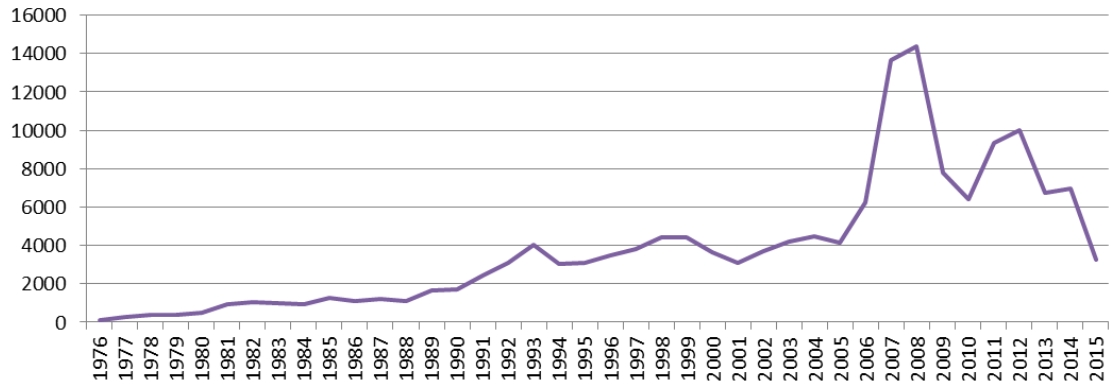

অসক্ষম ও অদক্ষ শ্রমিকের হার বেশি হওয়া: অবৈধ অভিবাসনের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার একটি বড় কারণ হলো ক্রমাগতভাবে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা হ্রাস। মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধির একটি বড় উৎস হলো মানসম্মত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ। দুর্ভাগ্যবশত স্বাধীনতার পর থেকে গ্রামীণ শিক্ষার মানে ক্রমাগতভাবে ধ্বস নেমেছে। শিক্ষার মানে এমন অবনতি ঘটেছে যে, গ্রামের স্কুল-কলেজ থেকে পাশ করা ছেলে-মেয়েরা এখন আর উচ্চশিক্ষার সুযোগ পায় না। চাকরির ক্ষেত্রেও এখন তারা পিয়ন-চাপরাশির চাকরির বেশি আশা করতে পারে না। কিন্তু দুর্নীতির কারণে ও তদবির করার জন্য মামা-চাচার অভাবে সেইপথও অনেকের জন্য রুদ্ধ। এছাড়াও বিনিয়োগের স্থবিরতার কারণে গ্রামে অন্য কোনো বিকল্প কর্মসংস্থানেরও সুযোগ নেই। তাই জীবন-জীবিকার সন্ধানে তাদেরকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিদেশে পাড়ি দেওয়ার বিকল্প আর কোনো পথ তাদের সামনে খোলা নেই। এ পরিস্থিতির এর অন্যতম কারণ হলো স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের নীতি-নির্ধারকদের একের পর এক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রতি তাদের চরম বিশ্বাসঘাতকতাস্বরূপ আচরণ।

শিক্ষার মানে ধ্বস: জিপিএ-ফাইভের ছড়াছড়ি ও পাশের হারের উর্ধগতি সত্ত্বেও গ্রামীণ শিক্ষার মানে কী ধরনের ধ্বস নেমেছে একটি উদাহরণ দিয়ে তা সুস্পষ্ট করা যায়। মেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি গ্রামীণ স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে এবার ১১০ জন ছাত্রী ভর্তি হয়। ভর্তির পর তাদেরকে যেসব বিষয়ে তারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগতা অর্জন করার কথা সেসব বিষয়ে একটি মূল্যায়ন পরীক্ষা দেওয়া হয়। মূল্যায়ন পরীক্ষায় অর্ধেক ছাত্রী (অর্থাৎ ৫৫ জন) পাশ করে এবং বাকি অর্ধেক অকৃতকার্য হয়। অকৃতকার্যদের মধ্যে ৩৬ জন ইংরেজিতে এবং ২৯ জন অঙ্কে ফেল করে। অকৃতকার্যদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্রী, যারা প্রাথমিক

বিদ্যালয়ের সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে, বাংলা রিডিং পড়ারও যোগ্যতা অর্জন করেনি। তাই মানসম্মত শিক্ষার অভাবে অনেক গ্রামীণ তরুণই এখন বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে।

এনটাইটেলমেন্টের অপচয়: সরকারিভাবে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীসহ নানান ধরনের কার্যক্রম প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের কাছে যথাযথভাবে না পৌঁছানোও মানবপাচারের অন্যতম একটি কারণ। সরকারি নীতি অনুযায়ী, এনটাইটেলমেন্ট বাড়ানোর জন্য অনেক ধরনের ব্যবস্থা থাকলেও দুর্নীতি এবং অপচয়ের কারণে সেগুলো কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে। স্মরণ করা যেতে পারে যে, অমর্ত্য সেনের মতে, ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ খাদ্যের অভাবের কারণে ঘটেনি। ঘটেছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্রয় ক্ষমতার অভাবে। তেমনিভাবে বর্তমানে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবিকার টানে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিদেশে পাড়ি দেওয়ার অন্যতম কারণ এনটাইটেলমেন্টের অপ্রতুলতা নয়, বরং এসবকে কেন্দ্র করে দুর্নীতি ও অপচয়।

দরিদ্রদের প্রতি বৈষম্য: বেশ কয়েক বছর থেকে বাংলাদেশ উচ্চহারে প্রায় ছয় শতাংশের বেশি হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে। প্রবৃদ্ধির হার অর্থনীতির স্বাস্থ্যের পরিমাপ করলেও, এটি একটি রাষ্ট্রের সব জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অবস্থার যথাযথ পরিমাপক নয়। সমাজে ন্যায়পরায়নতার অভাব থাকলে এবং বৈষম্য বিরাজ করলেও উচ্চ প্রবৃদ্ধির কারণে ধনীরা আরও ধনী হলেও দরিদ্রদের অবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটে না। দুর্ভাগ্যবশত এমনি অবস্থায় বিরাজ করছে আমাদের দেশে, যে কারণে মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জীবন-জীবিকার সন্ধানে বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন।

অসচেতনতা: পাচারকারী/দালালদের খপ্পরে পড়ে এবং সচেতনতার অভাবে অনেকে মানবপাচারের শিকার হয়।

মানবপাচার বন্ধে করণীয়:

এটি সুস্পষ্ট যে, বাংলাদেশ ও মিয়ানমার থেকে অনেক ব্যক্তি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পৃথিবীর অনেক দেশে, বিশেষত মালয়েশিয়ায় সাম্প্রতিক সময়ে পাড়ি জমাচ্ছে। এদের অনেকে পাচারকারীদের খপ্পরে পড়ে পাচারের শিকার হয়েছে এবং হচ্ছে। এদের কেউ কেউ জিম্মি, সর্বশান্ত ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারারুদ্ধ হয়েছে, এমনকি প্রাণও দিয়েছে। *মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২* আইনানুযায়ী, মানবপাচার একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। পাচারকারীদেরকে এই আইনের আওতায় এনে কঠোর শাস্তি দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

তবে পাচারকারীদের শাস্তি দিলেই হবে না, পাচারের উপরে উল্লেখিত কারণগুলোর প্রতিকারের ব্যবস্থা নেওয়াও জরুরি। একইসঙ্গে জরুরি রাষ্ট্রীয় সম্পদে দরিদ্রদের অধিকার নিশ্চিত করা। পাকিস্তান আমল থেকেই আমাদের নীতি-নির্ধারকরা তেলে মাথায় তেল দেওয়ার নীতি অনুসরণ করে আসছেন। স্বাধীন বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের এ বঞ্চনা যেন আরও প্রকট হয়েছে এবং রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় অনেক ব্যক্তিই দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়নের মাধ্যমে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছেন। মানবপাচার বন্ধ করতে হলে সরকারের নীতি-কাঠমোতে কতগুলো মৌলিক পরিবর্তন আনা দরকার। বিশেষত দরকার আমাদের জন্য একটি নতুন সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট বা সামাজিক চুক্তির, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের একটি অংশ সরাসরি দরিদ্রদের কাছে হস্তান্তরের একটি ব্যবস্থা। একইসঙ্গে দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাও জরুরি।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জীবন-জীবিকার জন্য বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন কিংবা পাচারের শিকার হয়েছেন তাদেরকে মানসিকভাবে অসুস্থ বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ নির্দেশ পালিত হলে রোগের পরিবর্তে রোগের উপসর্গেরই চিকিৎসা করা হবে। অন্যভাবে বলতে গেলে, এর মাধ্যমে দারিদ্র্যের কষাঘাতে পিষ্ঠ কিংবা পাচারকারীদের খপ্পরে পড়া ভিকটিমদেরকেই শাস্তি দেওয়া হবে, যা হবে উদোর পিণ্ডি ভুদোর ঘাড়ে চাপানোরই শামিল।

পাচারকারীদের কঠোর শাস্তি না দিলে এবং সমুদ্র পথে অবৈধভাবে মানবপাচার বন্ধ করতে না পারলে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও খারাপ হতে পারে। এছাড়া মানবপাচার তথা অবৈধ অভিবাসন বৈধ অভিবাসনের জন্য হুমকীস্বরূপ। তাই মানবপাচারে প্রতিষেধক নয়, প্রথমেই প্রতিরোধ করতে হবে।